নিজস্ব ভাবনায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক জানতে চেয়েছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার ধারণা—জানাতে চেষ্টা করি। অবশ্য এটি একেবারেই আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত— পণ্ডিতি আলোচনা নয়, আমার সে ক্ষমতাও নেই।

শক্তির একটা লেখায় আছে, সব কবির কবিতাই একটা দীর্ঘকবিতা তিনি টুকরো টুকরো করে লেখেন এইমাত্র। এমন কিছু টুকরো কবিতার অংশ—

১। আমার পেটকাটি চাই, কিংবা কাঁথা মায়াভরা পাড়
সংসার গেরস্থ, মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে...

২। আসলে কেউ বড়ো হয় না, বড়োর মত দেখায়
নকলে আর আসলে তাকে বড়োর মত দেখায়

৩। ডানহাতে বাঁহাতে ক্ষত, বাহুর পেনসিল লিখে চলে
যতদূর লিখতে চাই বাংলাভাষা যেন কথা বলে

৪। কেউ কি তোমার মত দুঃখকষ্ট ছিঁড়ে
কাগজের মতো পাতা ছড়িয়ে দিয়েছে?
যেভাবে বাতাস পাতা ছড়ায় জঙ্গলে
সেভাবে কি কেউ গেছে শুঁড়িপথ ধরে একা একা?

৫। পায়ে পায়ে ঘোরে আঠা, কবিতার কাদার কাঠামো
সুতো ছেঁড়ে জুতোর পেরেকে লেগে, পলাশের মতো
একটি কবিতা খুঁজে মরে কবি শান্ত মুখ বুজে।

৬। সকলের চেয়ে বেশি অহংকার নিয়ে একা আছি

৭। কবি হয়ে দাঁড়াবার আর কোন সাধ নেই মনে
শেষ হয়ে গেছে লোকটা, এও শুনে লাগে না আঁচড়
গায়ে সব শুনে শুই পাশ ফিরে সম্ভ্রান্ত বিশ্রামে।

৮। —তা আমায় কী কী দিতে পারবে?
—না ভেবে বলেছিলাম সব সঅব।
—সব মানে কৌটাকাটা, ঝুলবারান্দা, নিমের দাঁতন, রঙিন পর্দা, ঘর গেরস্থালি
—একেই তুমি সব বলো?
—সুবাস তেল, পানসুপুরি, আঁশটে বাহুবন্ধন...
—আর—আর?
—আর মাসমাইনে, ঘুষঘাষ, চুমুটুমু
—অসভ্য! ও ছাড়া যেন কথা নেই?
—আছে, কিন্তু শুনতে ভালো লাগবে না, যেমন ধরো চিরস্থায়ী মিথ্যে কথা।

৯। ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে জড়িয়েছে নিষ্ঠুর পিতাকে
যিনি সদা ভ্রাম্যমাণ, জনপদে জঙ্গলে, বিজনে
একদেশ থেকে অন্যদেশে ছুটে যান ক্রমাগত—
যিনি, এই আসছি বলে, দূরে চলে যান অকস্মাৎ।

এমন অজস্র পঙ্‌ক্তি পড়ার পর মনে হয়েছে শক্তির কবিতায় একটা বড়ো অংশ আত্মজৈবনিকও বটে; সে থাকাকালীন যা মন দিয়ে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি। আমাদের মত ঘর-গেরস্থালিতে আটকে থাকা সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে তা বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। আসলে একটা বড়ো ছবি দেখতে গেলে, বুঝতে গেলে অনেকটা পিছিয়ে দেখতে হয়। শিল্পীর রং তুলির ব্যবহার, সেগুলিকে মোছা, ইজেলের সঙ্গে তাকে পালটে ফেলা আর ছবি এঁকে ছিঁড়ে ফেলা, এই সবকিছুর দিকে যখন সতত দৃষ্টি রাখতে হয় এবং অংশগ্রহণও করতে হয় কখনো কখনো, তখন পরিপ্রেক্ষিতসহ ছবি দেখবার দৃষ্টি আসে না, ছবিরও পূর্ণতা তৈরি হয় না। সংসারের নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে স্ত্রী কখনো শুধুই পাঠিকা হতে পারে না, আর স্বামীর নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায় হলে ব্যাপারটা আরো অসম্ভব পর্যায়ে চলে যায়।

নিজের কবিতার দৃশ্যপটের সঙ্গে মিলিয়ে 'আগুন লাগলে মানুষ পোশাক যেভাবে ছাড়ে' শক্তি হুড়মুড় করে চলে

গেছে সেভাবেইতো, বলো যাবার সময় পায়নি— অবশ্য বলে যাওয়া তার কখনোই স্বভাব ছিল না। আচমকা ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতে আমরা এবং তার কাছের দুরের আর অনেক মানুষই ভিটেমাটি হারিয়েছিলাম বলা যায়। কতদিন ধরে কত স্মরণ সংখ্যা যে বেরোল, কতদিন ধরে স্মরণ সভা হতে লাগল, কত জানা অজানা মানুষেরা চিঠি লিখে সান্ত্বনা দেবার সঙ্গে সব হারানোর ব্যাথাও জানিয়েছিলেন তা হাতে গোনা যায় না। আমার মনে হয় কবি কৃষ্ণা বসুর দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে এই মানসিকতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

‘ভোররাতে মৃত্যু এসে চুরি করে নিয়ে গেছে প্রিয় কবিটিকে
চৈত্রভোরে টেলিফোন কেঁদে ওঠে আকস্মিক শোকের সংবাদে।’

এমনতরো আকস্মিক অন্তর্ধানের সঙ্গে যতই পরিচয় থাক, এই যাওয়ায় তো ‘যতদূর যেতে চায় যাক’ বলে সুতো ছাড়ার ব্যাপার ছিল না, এতে ক্রমাগত দূরে চলে যাওয়া। অনেক অনেকদিন লাগে ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার হতে তখন একতাল নিকষ অন্ধকারে আঁকড়ে ধরার মতো কিছু পাচ্ছি না। বাস্তবের কঠিন মাটিতে একসময়ে পা দিতে হয়, ভাবতে হয়। অবশেষে শক্তির বইগুলি পড়তে পড়তে একটা অবলম্বন খুঁজে পেলাম—শক্তিকেও। কিছু খুঁজে পেলাম তার লেখার মধ্যে। শক্তির অগোছালো স্বভাবের মতোই ১৯৯৫ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত পদ্যসমগ্রে কবিতার বইয়ের কালানুক্রমিকতা ছিল না, একই কবিতা একাধিকবার ছাপা হয়েছিল, অথচ দশ পনেরো বছর আগে লেখা অনেক কবিতা কোনও গ্রন্থেই স্থান পায়নি। মূল বইয়ের সঙ্গে সঠিকভাবে না মেলানোর জন্য খুবই দরকার ছিল। আরো দরকার ছিল বিভিন্ন পত্রিকা থেকে তার অগ্রন্থিত কবিতাগুলি, গদ্যরচনা এবং উপন্যাসগুলি জোগাড় করা। বেশ কিছু গ্রন্থাগার থেকে এবং অনেক সহৃদয় কবি, সম্পাদক, বন্ধুদের সাহায্যে যে কবিতাগুলি পেলাম সেগুলি দিয়েই নতুন তিনটি কবিতার বই ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। শক্তির প্রথম পর্যায়ের কবিতা এবং শেষের দিকে সামান্য কবিতা ছাড়া কোন পাণ্ডুলিপি ছিল না। যখন যে চেয়েছে সামনে বসেই তার হাতে কবিতা লিখে দিয়েছে, বাড়িতে পত্রিকা না আসলে সেগুলি পাওয়া যায়নি। এমন অদেখা কবিতার সংখ্যাই বেশি— এমনও যে কত কবিতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি!

গদ্য ও পদ্যসমগ্র সম্পাদনার কাজ হাতে নিয়ে ক্রমশ শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণভাবে পড়তে শুরু করি। সেই সময়েই ব্যক্তিগত পটভূমিকায় লেখা বেশ কিছু কবিতা স্পষ্টতর হয়েছে। অনুভূতিগুলি মনে অনুরণন তুলেছে। পড়তে পড়তে এক ভয়াবহ শূন্যতার সান্ত্বনা কিছুটা হলেও পেয়েছি, দূরত্বই এই নৈকট্য এনে দিলে এ কথা আজ কবুল করতে দ্বিধা নেই। ক্রমশ আমি শক্তির কবিতার মধ্যে মজ্জমান হইও—শুধুই পাঠক হবার অনুভূতিতে রসোপলব্ধি করি, কবিতাকে বিশ্লিষ্ট করি। এখন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও পারিবারিক শক্তি আমার কাছে সম্পূর্ণ আলাদা দুজন মানুষ। সেই সময়ে তার রচনার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা নজরে আসে, আগে সেভাবে তা লক্ষ করিনি।

প্রথমত— ব্যবহারিক জীবনে তার যতই বিশৃঙ্খলা থাক, কবিতা লেখার অন্দরমহলে সে রীতিমত সুনিপুণ গৃহিণী। কবিতা লেখার জন্য ছন্দ-প্রকরণের নিয়মকানুন শেখায় সে আপাদমস্তক বিশ্বাসী ছিল। এই বিশ্বাসে সে সনেটচর্চা করেছে প্রায় তিন বছর ধরে শিক্ষানবিশের মত। (এই সনেট চর্চার খাতা দুটি পরিত্যক্ত কাগজের বাক্সে ছিল।) প্রকৃতপক্ষে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরই প্রথম বই প্রকাশের কথা সে ভেবেছিল। প্রকাশক দেবকুমার বসুর লেখা থেকে জানা যায় প্রায় দু বছর ধরে কীভাবে ক্রমাগত কবিতা পালটে পালটে তাঁর চূড়ান্ত অসুবিধা করে তিনবার নাম পালটে দু বার মলাট পালটে শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’। সে বিশ্বাস করত সনেটের বন্ধনসীমা আয়ত্ত করার মধ্যেই সঠিক শব্দপ্রয়োগের কলাকৌশল লুকিয়ে আছে। মুখে বলেছে, লিখে জানিয়েছে— ‘বিহ্বলভাবে ছন্দ ভাঙার আমি ঘোর বিরোধী।’ অন্যত্র—

‘ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতি প্রথা আছে
এবড়ো খেবড়োভবে ভাঙলে, ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে
গায়ে, আর লোকে বলবে, একেই তছনছ করা বলে।
অশিক্ষাও বলে কেউ, বলে মূর্খ ভাঙা শিখতে হয়
অপরূপভাবে ভাঙা গড়ার চেয়েও মূল্যবান।’

দ্বিতীয়ত—উপন্যাসে তো বটেই, কবিতার বিষয় নির্বাচনেও সে নিজস্ব পরিমন্ডলের মধ্যেই থাকতে পছন্দ করেছে। সে কারণে তার অধিকাংশ কবিতা টুকরো টুকরো লেখা আত্মজীবনীর অংশ বলে মনে হয়।

তৃতীয়ত— একটি কবিতার পঙ্‌ক্তির অংশবিশেষ পরবর্তী সময়ে কাব্যগ্রন্থের নাম হিসেব ব্যবহৃত হয়েছে। ‘উড়ন্ত সিংহাসন’, ‘পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি’, ‘অস্ত্রের গৌরবহীন একা’ ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’ এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। দ্বিতীয় কবিতার বই ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ প্রকাশিত হবার অনেক আগে অগ্রস্থিত একটি কাব্যাংশ ‘আমার জিরাফই ভালো লাগে, তোমারে লাগে না।’

চতুর্থত— শক্তি প্রথমদিকে গল্প লিখেছে অনেক, সেগুলি আবার পরাবাস্তবতাধর্মী গল্প। একটি গল্প বা কবিতা লেখার পনেরো বছর বাদে সেই চিন্তাধারার অনুকূলে কবিতা বা গল্প লেখা হয়েছে মাঝে মাঝে। 'চতুর্দশপদী কবিতা'র একটি উদাহরণ—মহীনের ঘোড়াগুলি মহীনের কাছে ফেরে নাই'—এই লেখার ভাবনা রয়েছে হৃদয়পুর উপন্যাসে। নায়ক নিরুপম ভাবে— 'কে মহিম? কে জেব্রাগুলি এবং ঘোড়াগুলি? ওগুলির ফেরা কি মানুষের কাছে নিরর্থক নয়? জ্যোৎস্নায় ঘুরে ঘুরেই কি ওরা মানুষের থেকে বহুদূরে কোন অলৌকিকতায় সরে যায়।' 'অলৌকিক জাহাজ' কবিতার গদ্যরূপও আছে এইভাবে—

গঙ্গায় স্তব্ধভাবে পশ্চিমা জাহাজ একটি। তাকে জেব্রার মতো, জিরাফের মতো মনে হল, মনে হল অলৌকিক। জাহাজের গায়ে দুটো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল, কিন্তু জাহাজও তাকে কামড়ে ধরে। এ কী! সে প্রাণপণে হাতগুলো ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনমতে ছাড়াতে পারল না। হঠাৎ বাঁশী বাজিয়ে দিল সেই জাহাজ। নিরুপমকে হু হু করে বয়ে নিয়ে চললো পশ্চিমদিকে।' উৎসাহী পাঠকরা চতুর্দশপদীর ৪৬,৪৭,৪৯,৫০,৫৪,৫৫,৫৬,৫৭, সংখ্যার কবিতাগুলি পড়ে দেখতে পারেন।

পঞ্চমত— শক্তির শব্দচয়নে কিছু শব্দের উপর পক্ষপাত; অনেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তথ্যবহুল আলোচনায় যাচ্ছি না— শুধু আমার বিস্ময়ের জায়গা জানাচ্ছি। শব্দ, সুন্দর, চাঁদ, ট্রেন, ইস্টিশন, চিতা, শ্মশান, মৃত্যু, বিষাদ, কলকাতা, পাথর, জঙ্গল, গাছ, শিকড়, ভালোবাসা, বাঘ এই শব্দগুলি তার কবিতায় নতুন অর্থবহ হয়ে উঠেছে— শুধু তাই নয় কিছু কিছু শব্দ প্রাণবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোধহয় 'শব্দ'—সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

—শব্দ কোলজোড়া ছেলে, হাসে, কাঁদে, হিসি করে বুকে
—শব্দরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে
—শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি
ছেলেবেলার শব্দ তুমি আমার দিকে তাকালে না।
—শব্দের নিজস্ব কিছু অনুতাপ তাকে পুড়িয়েছে জ্বরে
—আমিও দুঃখিত হই শব্দের নিজস্ব অনুতাপে
শব্দের এহেন ব্যবহার আমি আর কোনো কবিতায় দেখিনি।
'সুন্দর' শব্দটিকেও আশ্চর্য চরিত্র হয়ে উঠতে দেখি—
—সুন্দর যেমন ক্লান্ত, আমি তার মত হই রোজ
—সুন্দরের হাত দুটি বেঁধে দাও সময় হয়েছে
—সুন্দর ঘনিষ্ঠ হয়ে একদিন উঠোনে বসেছে
—সুন্দর সমুদ্রে যেতে ভালোবাসতো
—সুন্দর আমার কাছে শুয়ে আছে মানুষের মতো
—আবার সুন্দর তুমি কেন আসো, ভিখিরির মত আমাকে জ্বালাতে!
সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিটি এখনও আমাকে মাঝে মাঝে জ্বালাতন করে।
চাঁদ সবসময় চরিত্রব্যঞ্জক নয়, চাঁদের উপমাও আশ্চর্যরকমের : উপমা, উপমেয় ও উৎপ্রেক্ষা একাকার।
—বাঘের মুড়োর মত চাঁদ
—আকাশে চাঁদ ওঠে একফালি/মিষ্টি কুমড়োর মত বিচিভুতি সুদ্ধ চাঁদ
—মাথার উপরে এ্যালুমিনিয়াম চাঁদ
—চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড়
—এখনো চোখ বুজলে দেখতে পাই/ আকাশের গা বেয়ে এক গাধা হেঁটে চলেছে আর জঙ্গলের মধ্যে চাঁদ।
—রুগ্ন চাঁদ শশার মতন/পাঁচিলে আছাড় খায়।

উদাহরণ না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাই। শক্তির অনুবাদপ্রিয়তাও লক্ষণীয়। ১৯৬০ সালে সে অষ্টম-নবম-একাদশ অধ্যায় গীতার অনুবাদ শুরু করেছিল ২/৩টি ছোট পত্রিকায়। মনে রাখা দরকার সেই সময়েই সে প্রচণ্ড তীব্র অস্বস্তিকর কিছু কবিতা ওই একই পত্রিকায় লিখেছিলো। সম্পূর্ণ গীতার অনুবাদ অবশ্য সে সারাজীবনে কয়েকবার চেষ্টা করেও শেষ করতে পারেনি। বারবার বসতো, কিন্তু অসম্পূর্ণ রেখেই উঠতে পড়তো— বলতো 'বড় কঠিন'। কিন্তু মূল থেকে মেঘদূত, কুমারসম্ভব অনুবাদ করতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। এমনকি প্রকাশকের ঘর থেকে পাণ্ডুলিপি দীর্ঘদিন ধরে আদায় করতে না পেরে কুমারসম্ভব দুবার অনুবাদ করতে হয়েছিল এ কথা বইয়ের ভূমিকায় সে লিখেছে। এ ছাড়া ইংরেজির মাধ্যমে পাবলো নেরুদার দুটি বই, লোরকা, হাইনে, মায়াকোভস্কি, রিলকে, কহলীল জিব্রান, আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কবিতাও অনুবাদ করেছে। উইলিয়াম ব্লেকের অনূদিত কবিতা আমি তার চলে

যাবার পর প্রকাশ করেছি।

ওমর খৈয়ামের রুবাই আমাদের সখীসংবাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তার লেখা থেকে জেনেছি কোন এক পারস্য ভাষাবিদের সাহায্য এ সময় যে পেয়েছিল, ফিটজেরাল্ডের ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে। মির্জা গালিবের কবিতা মূল উর্দূ থেকে আয়ান রশিদ খানের সাহায্যে অনুবাদ করেছিল। কেন শক্তি এত অনুবাদ করত অনেকে জানতে চেয়েছিলেন। আসলে তারই ভাষায় 'যখন কবিতা তাকে ধরা দিত না' তখন বৃথা সময়কে বয়ে যেতে না দিয়ে কবিতা লেখার মকশো হিসাবেই অনুবাদ করাটা ছিল তার পছন্দসই কাজ।

শক্তির কবিতার বিবিধ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতা প্রবণতা নিয়েও আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। আফশোস হয় কবি যখন সামনে ছিল এ সম্পর্কে কেন জেনে নিইনি, কিন্তু সেটা তো সম্ভব হয়নি— হতে গেলে জীবনযাত্রা আরও স্থিতিশীল হওয়া দরকারি ছিল। আজ যদি তাকে সামনে পেতাম স্ত্রী হিসাবে নয়, পাঠিকা হিসাবেই প্রতিবেদকের মতো তাকে কিছু প্রশ্ন করতাম। এমন কিছু সাহিত্যিক কূট প্রশ্ন নয়, খুব সাধারণ কিছু প্রশ্ন, যেমন—

একেবারে প্রথম দিকের কবিতা 'আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে', 'খুব বেশিদিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।'—মৃত্যুর এই স্থায়ী সুরকে শ্মশান, চিতা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে 'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি আমাকে পোড়াও' এমনকি 'আগুনে পুড়ে গেল লোকটা কবি ও কাঙাল' পঙ্‌ক্তিগুলির মাধ্যমে যে জীবিতাবস্থাতে ধারাবাহিক গাঢ় বিষাদধর্মী, এপিটাফ লিখেছিল, সে কেন একেবারে শেষপর্যায়ে লেখে—

'সকল প্রতাপ হল প্রায় অবসিত
জ্বালাহীন হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে
কিছু মায়া রয়ে গেল দিনান্তের
.....
জীবনযাপনে আজ যত ক্লান্তি থাকে
বেঁচে থাকা শ্লাঘনীয় তবু।'

সমাজ সংসারকে যে কোনোদিনই গুরুত্ব দেয়নি, 'সকলের বেশি অহংকার নিয়ে' যে একা ছিল, তার কেন মনে হল—

'সমাজের প্রান্তে আসা বড়ো প্রাসঙ্গিক
এখন এ সন্ধ্যাবেলা।'

সারাজীবন ধরে যে 'বাহিরের বাঁশির' ডাক শুনে একবস্ত্রে ঘর ছেড়েছে—প্রকৃতি বন্দনায় যার কবিতা প্রায় পৌনঃপুনিকতায় দুষ্ট, ভ্রমণের অনুষঙ্গেই কবিতায় বারবার এসেছে, ইস্টিশান, রেলগাড়ি, ব্রিজ এইসব শব্দ, সে কেন লিখল—

'সানুদেশে উপত্যকা জুড়ে এক দৃশ্যের সুষমা
দুদিনের জন্য টানে, চিরদিন নয়।'

শক্তি লিখেছিল 'কবিতা লেখা আমার বেঁচে থাকার জন্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবার মত প্রয়োজনীয়।' 'অসংখ্য শব্দের প্রাণ আমি নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করেছি।' এ সব স্পর্ধিত উক্তির পর 'কবিতা লেখার ক্লান্তি' বইতে না পেরে 'কবিতার হাত থেকে মুক্ত' হবার জন্য সে কেন অধীর হয়? কেনই বা তার মনে হত—

'কী হবে জীবনে লিখে? এই কাব্য এই হাতছানি
এই মনোরম মগ্ন দিঘি—যার দুদিকে চৌচির ধমনী!

এমন অনেক হাহাকারে ভরা লেখা রয়েছে তার মানে নিজের মতো করে বুঝি না তা নয়, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে কবি কী বলতে পারতেন আজ জানতে ইচ্ছা করে। তবে সব কী ও কেন-র উত্তর কবিই দিতে পারেন? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলতেন— একটা কবিতা পড়ে তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি ভাবতে পারো, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম— তোমাকে দশটা টাকা দেওয়া হল, তুমি তা সন্দেশ খেয়ে খরচ করতে পারো, ফুচকা খেয়েও শেষ করতে পারো, আবার খরচ না করে টাকাটা হারিয়েও ফেলতে পারো।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শক্তি লিখিতভাবে অনেক অভিযোগ করেছে—তাঁর বহু লেখার মধ্যে তিনি পিতার কথা লিখলেও মাতার কথা লেখেননি, কলকাতা শহরে সারাজীবন বসবাস করেছেন, কিন্তু লেখার মধ্যে কলকাতা নামমাত্র স্থান পেয়েছে, তাঁর নাটকগুলির চরিত্র রক্তমাংসের নয়, তাঁর কবিতাগুলির বেশ কিছু মনে না রাখলেও ক্ষতি নেই। শুধু

লেখাই নয় শান্তিনিকেতনের বুকে বসে একটি আয়োজিত সভায় এমন ধরনের কথা বলে যে সকলের অপ্রীতিভাজন হবার ঝুঁকি নিয়েছিল, আজ দেখা হলে জানতে চাইতাম সে কেন ২/৩ টি গদ্যে এব্য ৫/৬ কবিতায়, সরাসরি আর কিছু কবিতার খণ্ডাংশে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিল? একাধিক সাক্ষাৎকারে সে লিখেছিল—

'রবীন্দ্রনাথ ব্যাপার টি আমাদের জল হাওয়া আকাশের মতই অনিবার্য। তিনি আমাদের নিশ্বাসে আমাদের রক্তের এক হয়ে মিশে আছেন।'

'আমি রবীন্দ্রনাথকেও নিয়েছি। ধর্মে আছো জিরাফেও আছো'তে রবীন্দ্রনাথের মতো সহজ ভাষায় কবিতার দুটি নমুনা—

'ছেলেবেলা দীর্ঘকাল তুমি ছিলে দুঃখের দোসর
সুখ! কিংবা তার চেয়ে ঢের বড়ো শান্তিনিকেতন
কিন্তু চিঠি দিতে না প্রত্যহ, কানে কানে
হাতে ধরা টেলিপোস্ট বার্তা দিয়ে জানাত বিদায়
টকির ঘনান্ধ পর্দা রীতিমত মৃত্যুতে সাজালে।'
'ইচ্ছে হত একদিন চুরি করে ভাষার বাগানে
ঢুকে পড়ে ফুল তুলি, যে ফুলে তোমারই পূজা হবে
কিন্তু ভয়ে ভয়ে তার পাশ দিয়ে গেছি প্রতিদিনই
অথচ তোমার দয়া সম্পদে বিপদে
আমায় করেছে ঋণী...'

অবশ্য...তন্ময় হয়ে শক্তির রবীন্দ্রসংঙ্গীত গাইবার স্মৃতি আমি কেন অনেক পরিচিত মানুষই মনে করতে পারেন।

বিভিন্ন কাগজপত্র থেকে সাক্ষাৎকারগুলি সংকলনও করেছি পদ্যসমগ্র সমাপ্ত হবার পর। আগে সেভাবে চোখের সামনে সবকিছু এভাবে সাজানো ছিল না—তা হলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঝগড়ায় অবশ্যই জিততে পারতাম এবং মানসিকতার বৈপরীত্যে নিয়েও উত্তর চাইতে পারতাম।

শক্তির লেখা, বিশেষত কবিতা সম্পর্কে আর একটা বড় খটকা হল তার ঈশ্বর। এখানে অবশ্য বিপরীত চিন্তাধারা নেই। শক্তিকে দেখেছেন যাঁরা তাঁরা জানেন, তাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী বলে মনে হওয়া মুশকিল ছিল, প্রচলিত ধর্মাচার মান্য করা ও মন্দিরে যাওয়া বা ঈশ্বরে আস্থা রেখে জীবনযাপন করা কখনো দেখিনি। 'ইশ্বর থাকেন জলে' কবিতার বইটি প্রকাশিত হবার পর সেজন্য অনেকেই তার ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সে যা উত্তর দিয়েছিল তা মোটমুটি এরকম— 'ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। ফল্গু নদীর মত অন্তর্বিশ্বাস। কোন পুজো আচ্চা-ফুলচন্দন নয়, প্রত্যক্ষ তাঁর সঙ্গে এই আমার এক অনিবার্য যোগ। জগন্নাথদেবের মত অসহ্য সুন্দর তিনি। দুটি হাত কাঁধের কাছ থেকে পরিহার করা হয়েছে। দুটি চোখ দিগন্ত বিস্তৃত। কাজ নেই। শুধু চোখ মেলে দেখা। তারই নাম প্রকৃত অবলোকিতেশ্বর।' অন্যত্র সে বলেছে বিপদে পড়লে সে ওই সর্বশক্তিমানের শরণাপন্ন হয়, যিনি তার অকালপ্রয়াত পিতৃপ্রতিম— তিনি তাকে মধ্যরাতে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেন।'

প্রায় সন্তের মতো ঈশ্বরবিশ্বাস শক্তির কবিতায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহমান শুধু তার প্রকারভেদ আমার চোখে খানিকটা অদ্ভুত মনে হয়েছে। কিছু উদাহরণ রাখি—

—বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে আছো দেবতা আমার
—কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
—কে যেন ঈশ্বর তাই মাঠে বসে আছে
—কে যেন ঈশ্বর তাই বাঁধে বসে আছে
.....
কে যেন ঈশ্বর তাই একলা বসে আছে
—ঈশ্বর আছেন একা।
উৎখাত করা চলে যেন কোন সময়।
—ঈশ্বর গাইছেন গান, তাঁর পথশ্রমে ক্লান্ত ধুলো
লেগে আছে দুটি পায়

তবু তা স্পন্দিত হল নাচে

—যদি সারাদিন তাঁকে কাছে পাওয়া যেতো

কাছে পেতে গেলে কাছে যেতে হয়, এভাবে চলে না
হাতের সমস্ত সেরে, ধুয়ে মুছে সংসার-সমাধি
গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে...

—কবিতা লেখার ক্লান্তি আমি আর বইতে পারবো না
.....ছুটি নিই
আমাকে মঞ্জুর করো, আর্জিপত্রে টিপছাপ দাও
নিরক্ষর ভগবান

যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে বসে তিনি
উদুখলে কোটেন ঘনশ্যাম শস্য
—ঈশ্বরের দু বাগানে জল
একটিতে আছেন কিশোরী।

ঈশ্বর বিষয়ক যৎসামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হল। উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও দিতে বাধ্য হলাম। কেননা মৃত্যু ও বিষাদের মতো তার কাব্য ভাবনায় ঈশ্বর ভাবনাও এক মূল বা স্থায়ী সুর। তবে তা বড় বিচিত্র—শক্তির ঈশ্বর জলে ছাড়াও আরো কত জায়গায় যে থাকেন! তিনি 'এক মুঠি আতপের জন্য ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে রাখেন আবার তিনি 'নিরক্ষর'ও বটে। তাঁকে 'উৎখাত' করা চলে আবার তিনিই যে কি করে তার পারাপারের কাণ্ডারি হতেন তাও আর জানা হল না। তবে অনেক প্রশ্নের উত্তরও যে পদ্যসমগ্র থেকে পেয়ে গেছি একথাও সত্যি—

শুধু বাঁচার অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালোটের
মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, যেমন তেমন করে নয় এই বাঁচা
শুধু নয়, দুদু চাই, সুখ ও সমগ্রভুক আমি।
.....
ভেঙে দেবো—সবাই যে ভাবে ভাঙে, সেভাবেও নয়
পরম আদরে ভাঙবো, যন্ত্রে ভাঙবো, নেবো কোলে তুলে—
তাপর দুহাতে মুখ প্রতিষ্ঠিত করে দেবো টিপে
সচেতনভাবে দেখবো—কী ভাবে সম্পর্ক চলে যায়—
হায় মানুষের প্রেম, গেরস্থালি, জন্মদিনগুলি।

লেখার পরিশিষ্টে চুয়াল্লিশ বছর আগেকার একটু প্রাক্‌কথন জানাই। ১৯৬৬ সালে আমরা চারবন্ধু 'সখীসংবাদ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম। সেই পত্রিকা মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ছিল, লেখাতেও মহিলাদেরই অগ্রাধিকার দেবার জন্য সম্ভব অসম্ভব অনেক লেখিকার কাছে গেছি। আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, লীলা রায় (অন্নদাশংকর রায়ের স্ত্রী) কে পায়নি, কিন্তু পেয়েছিলাম জ্যোতির্ময়ী দেবী, করুণা বন্দোপাধ্যায়, গৌরী আইয়ুবকে—আমাদের পরম ভাগ্য বলে মানি। লীলা রায় অবশ্য বাংলায় লিখতেন না, সেকথা না জেনেই আমরা গেছিলাম। তিনি আমাদের অনেক সময় দিয়েছিলেন এবং অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন সদ্য এম.এ পাশ করার পর পড়াশোনাটা ভালোভাবে চালিয়ে যাবার জন্যে রিসার্চ করা উচিত। পত্রিকা তো তার পরে আছেই। তখন উঠতি বয়সের ঔদ্ধত্যে বলেছিলাম আবার রবীন্দ্রনাথ নয় শরৎচন্দ্র? উৎসাহ পাই না, রিসার্চ করার বিষয়ের অভাব। উনি বললেন 'কেন? নতুনদের নিয়ে করো। এই শক্তি চট্টোপাধ্যায়, খুব ভালো লিখছেন তাকে নিয়েই করতে পারো।' শক্তির সাকুল্যে তখন তিনটি বই আর লেখার চেয়ে অন্য গুণপনার আলোচনাই বেশি চলে। শক্তিকে ভালো করে চিনিও না তখন। আমরা বাইরে এসে খুব হেসেছিলাম— লীলা দি বেঁচে থাকলে শেষ হাসিটা তিনিই হাসতেন। পদ্যসমগ্র ৭ম খণ্ড শেষ হয়েছে ২০০০ সালে, মাত্র ৩৪ বছর দেরি হয়ে গেল। পদ্যসমগ্র এবং গদ্যসমগ্র সম্পাদনা কি রিসার্চ করার চেয়ে কম কিছু?